কুরআন-দর্শন

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

কুরআান-দর্শন

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

কুরআন-দর্শন
প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

প্রকাশক: লেখক

প্রকাশকালঃ জুলাই, ২০২৪

বিনিময় মূল্যঃ একশত টাকা মাত্র।

Quran-Dasrshan by Dr. Syed Badiuzzaman Faruque, Department of Physics, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet, Bangladesh.

উৎসর্জন

“শ্রদ্ধেয় দাদা ভাইজান ও
ফরিদ ভাইজানের রূহের মাগফিরাত কামনায়।”

“একজন দরিদ্র, রুগ্ন ও অসহায় লেখকের
পক্ষ থেকে রুহানিয়াতের
পথে চলার আহবান।”

উপক্রমনিকা

বর্তমানে বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সয়লাবে মানুষ প্রকৃত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত। স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, টেবলেট এসবের মধ্যে মানুষ এমনভাবে ব্যস্ত যে-কোন কিছু পড়া তাদের হয়ে উঠেনা।

পড়াশোনা যা আছে -তাতে ধর্মীয় সাহিত্যের স্থান বলতে গেলে নেই অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীর (সাঃ) কাছে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ধীরে ধীরে কুরআন নাযিল করেছেন।

আল-কুরআন এমন এক কিতাব যার তুল্য সর্বকালে ছিল না, এখনও নেই। কি নেই কুরআনে? ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, দর্শন ও সর্বোপরি সবচেয়ে সত্যভাষণে ভরপুর এই কুরআন। তাই সকলেরই উচিত-কুরআন পাঠ করা

ও গবেষণা করা। এর ফলে-জীবন যেমন সমৃদ্ধ হবে-তেমনি পরকালীন অনন্ত জীবনে আল্লাহর কাছে পুরষ্কার পাওয়া যাবে। সেই পুরষ্কার তথা জান্নাতি জীবনে মানুষ প্রকৃত জ্ঞানী, আল্লাহর প্রকৃত বন্ধুতে পরিণত হবে।

জান্নাতের জন্য কেউ যখন লালায়িত হবে, তখন তার জন্য কুরআন-সুন্নাহর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমার নিজের জীবনে কুরআন গবেষণা শুরু হয় ত্রিশ বছর বয়সে আর বিষয়টি ছিল সূরা নূরের এই আয়াত, "আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতী ওয়াল আরদ্ব------।" এই পরিমাণ কুরআনিক ভাষ্য আমাকে জীবন গড়তে সাহায্য করেছে প্রভূতভাবে। অতঃপর আজ দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে আমি কুরআনের উপর দৃষ্টিপাত করছি। অনেক আয়াত আছে যেগুলো আমাকে খুব প্রভাবিত করে।

সেসব আয়াতের কয়েকটির উপর আলোকপাত করবো বলেই কলম ধরেছি। যা লিখবো তা নিয়ে অনেক গবেষণা ইতোমধ্যে হয়েছে। তাই বলে পাঠক

যে-আরো অগ্রসর হতে পারবেন না তা নয়। পাঠকেরা জ্ঞান-প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল হউন-এই কামনা করি এবং নিজের জন্য হায়াতে-তাইয়্যেবার দোয়ার দরখাস্ত করছি। অতঃপর বইটি আদ্যোপান্ত পাঠের আমন্ত্রণ জানাই এবং চিন্তা-গবেষণার জগতে পদার্পনের আহবান জানাই।

ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক
অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

সূচীপত্র

ভূমিকা

অধুনা মানুষের মধ্যে পুরনো কালের মত কুফরী ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু কেন? এর একটা কারণ হতে পারে এই যে, মানুষ স্মার্টফোনে অতিরিক্ত আসক্ত। ফলে কুরআন-হাদীস পড়ার আগ্রহ তাদের থাকেনা। নামাজও মানুষ যেনতেন প্রকারে আদায় করে। ইসলাম এখন হয়ে গেছে ফ্যাশন। এ থেকে বেরোতে হবে। কেন? আল্লাহ কি আমাদের ইলাহ, প্রভু, রব নন? আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কি কোন কিছু সমাধা হয়? না- আল্লাহ আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অধিপতি। তা মানুষ মানুক বা না মানুক। আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আল-কুরআনের বিক্ষিপ্ত কিছু আয়াতের উপর আলোকপাত করেছি। যদিও সংক্ষেপে- তবে চিন্তা করলে এ থেকে অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান বেরিয়ে আসবে।

আসুন আল-কুরআন চর্চ্চা করি। সে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করি। এটা করলে আমাদের জীবন সুখে ভরপুর হয়ে যাবে।

এই বইয়ের নাম রেখেছি রিফ্লেকশন ফ্রম আল-কুরআন, তথা কুরআন-দর্শন। অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে আমাদের কাছে কী ফিরে আসে! নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ ভালটাই।

সুতরাং যখন একটি আয়াত শেখা হবে তখন বলা চাই- "আল্লাহুম্মা লাক্বাল হামদ ওয়ালাকাশ শুকর। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শার।"

আর বেশী কিছু না লিখে মূল বইয়ে যাই। পাঠক, মনোযোগ সহকারে এবং চিন্তা ভাবনার সাথে পড়বেন। অনেক উপকার পাবেন দুনিয়ায় ও আখেরাতে। আমীন।

নাচিজ,
প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক
সিলেট, জুলাই-২০২৪।

১

<u>*ফ্রম সূরা আসর*</u>

শুরু করছি রাহমান ও রাহিম আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মহাপবিত্র আল-কুরআন নাজিল করেছেন সুদীর্ঘ ২৩ বছর ব্যাপি। আল-কুরআনের একটি অনুপম সূরা বা অধ্যায় হলো সূরা আসর। ঐ সূরায় আল্লাহ বলেন, "কসম যুগের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।"

ছোট একটি অধ্যায় কিন্তু এর ভেতরেই পুরে দেয়া হয়েছে ইসলামী শিক্ষার সারমর্ম। আল্লাহ এখানে মানুষকে ইতিহাসের দিকে মনোযোগ দিতে বলেছেন অর্থাৎ কসম খেয়েছেন যুগের। ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ প্রতিটি যুগ একেক রকম

রংয়ে রঞ্জিত। কিন্তু সেই বিচ্ছিন্ন রংয়ের যুগগুলো একটি বিষয়ে পরস্পর যুক্ত। কী সেটি? আল্লাহ এর জবাবে বলছেন যে, “নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।”

ইসলামী ধ্যান ধারণায় প্রতিটি যুগ সংজ্ঞায়িত হয় কিছু পাপ যা মানুষ ঐ যুগে করতো এবং এক বা একাধিক নবী যারা মানুষকে ঐ সকল পাপ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র ইবাদাতে ফিরে আসার জন্য কায়িক-মানসিক পরিশ্রম করেছেন। প্রথম মানব ও নবী আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ থেকেই মানব সমাজে পাপ প্রবেশ করেছে ইবলিশের কুমন্ত্রণায়। তবে আল্লাহ আদম (আঃ) এর দু'সন্তানের কাহিনী বলেই ঐ যুগ ছেড়ে দিয়ে নূহ (আঃ) এর যুগের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। হযরত নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর জীবিত ছিলেন এবং ঐ সুদীর্ঘ সময় ধরে তার জাতিকে সত্যের দিকে আহবান করেছেন। তবে সুদীর্ঘ ঐ যুগে অল্প কজন (১০০ এর কম) ব্যতিরেকে সকল মানুষ কুফরে নিমগ্ন ছিল। তারা কি ক্ষতির মধ্যে ছিল না? নিশ্চয়ই। তাইতো আল্লাহ মহাপ্লাবন দিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন

করান অল্প কজন মানুষ ব্যতিত যারা নূহ (আঃ) এর বিরাট নৌকায় আশ্রয় নিয়েছিল আল্লাহ ও নূহ (আঃ) এর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার কারণে। তাদের প্রধান গুণ ছিল একটি যথা ঈমান বা বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস ও আস্থা। এই মানুষগুলো ক্ষতির বাইরে। এরা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। তারা তাদের ঈমান ও ঈমান প্রসূত সৎকর্মের কারণে দুনিয়াতেও লাভবান হয়েছে আর আখেরাতেও রয়েছে তাদের জন্য মহাপুরষ্কার।

মানুষের কাছে আল্লাহ কী চান? আল্লাহ চান মানুষ অদৃশ্যের উপর চিন্তভাবনা করবে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে এবং শুনবে তাদের কথা যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য কী তা মানুষকে শুনিয়েছেন। এখানে সত্যধর্মের দু'টি প্রধান পিলার বলা হয়ে গেলো।

সূরা বাকারা'র প্রথম চার আয়াতের দিকে মনোযোগ দেয়া যাক।

আল্লাহ সেখানে বলেন, "আলিফ লাম মীম।" "এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ

প্রদর্শনকারী পরহেজগারদের জন্য, যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। ----------- এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যাকিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।"

এই আয়াতে সূরা আসরের ব্যাখ্যা অনেকখানি করা হয়েছে। যেমন, সেখানে রয়েছে "যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে।" আর সূরা বাকারার উদ্ধৃত আয়াতে বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্র বলে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ "অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস।"

অদেখা বিষয়াবলীর মধ্যে প্রথমেই রয়েছেন তিনি যিনি এ মহাজগত সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লা জালালুহ। বিশ্বাসের দ্বিতীয় ক্ষেত্র হলো আল কুরআনসহ সকল আসমানী কিতাব। অতঃপর দ্বিতীয় প্রধান বিষয় যাতে অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে-তা হলো পরকাল বা মৃত্যুর পরের জীবন বা

আখেরাতে। সূরা আসরে বিশ্বাস স্থাপনের পর সৎকর্ম যারা করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় বলে আল্লাহ বলেছেন। আর সূরা বাক্বারায় প্রথমেই বিশ্বাস স্থাপনের পর নামাজ প্রতিষ্ঠার শর্ত দেয়া হয়েছে। সুতরাং প্রধান সৎকর্ম হিসেবে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হলো নামাজ। নামাজ কী? নামাজ হলো এক ও একক আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব করা আল্লাহকে না দেখেই। বুদ্ধিমান মানুষেরা অদৃশ্য স্রষ্টার বন্দেগী করেন।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে যারা আছেন তারা অদেখা রব আল্লাহকে মানতে নারাজ। তাদের বুদ্ধি থমকে দাঁড়িয়ে আছে কিছু দার্শনিক যুক্তির তীরে। তারা মনে করেন ডারউইন সত্যের নিকটবর্তী যিনি বলেছেন বিবর্তনের ফলে নিম্নস্তরের কীটপতঙ্গ থেকে আরম্ভ করে উচ্চস্তরের সকল প্রাণী, এমনকি মানুষের সৃষ্টি। ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। সৃষ্টিতে ডিজাইন আছে, সুতরাং অবশ্যই ডিজাইনার আছেন যিনি সবকিছুর ডিজাইনার। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে- ডিজাইনার কেবলমাত্র একজন যিনি মুসলমানদের আল্লাহ।

সেই আল্লাহর দাস হলো মানুষ আর মানুষের কাজ হলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের বন্দেগী প্রকাশ করা আল্লাহর শানে। আর নামাজ হলো সেই সর্বোচ্চ বন্দেগী।

নামাজের জন্য শর্ত হলো এই যে, তা পবিত্রতার সাথে আদায় করতে হবে। আগে পবিত্রতা, তারপর নামাজ। ইসলাম ধর্মে পবিত্রতাকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়া হয়েছে। একে তো নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, এসব বন্দেগীর জন্য পবিত্রতা শর্ত, তবু পবিত্রতা এক স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়ে আছে যা মুসলিমদের জীবনে বহমান। আর এজন্যেই সিহাহ সিত্তা বা বিশুদ্ধ ছয় হাদীসের কিতাবের একটি- 'নাসাঈ' শরীফ শুরুই হয়েছে পবিত্রতার অধ্যায় দিয়ে। পবিত্রতার প্রধান ফলাফল হলো এটি-অশ্লীলতা, হোক প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য, থেকে মুক্তি। দ্বিতীয়তঃ হলো অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকা।

এ সর্ম্পকে সূরা আল-আনকাবুত-এর ৪৫নং আয়াত দ্রষ্টব্য। অতঃপর প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো যারা নামাজ ঠিকমতো এবং নিয়মিত আদায় করে

তাদেরকে আল্লাহতায়ালা প্রশস্ত রিযিক দিয়ে থাকেন। সূরা তোয়াহার ১৩২নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "And enjoin Salat on the people, and be constant therein. We ask thee not for provision; it is We that provide for thee. And the end is for righteousness. "(Quran 20:132). এ কারণেই নামাজ হলো সর্বপ্রধান ইবাদাত বা দাসত্বের স্বীকৃতি। সুতরাং সৎ কর্মের মধ্যে প্রথমেই শামিল হয় নামাজ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে- কাফির এবং মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য হলো ওরা নামাজ পড়ে না আর এরা (মুসলিমরা) নামাজ পড়ে।

ফিরে যাই সূরা আসরের ২য় আয়াতে। আল্লাহ বলছেন, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। প্রমাণ কি? প্রমাণ হলো মহাকালের ইতিহাস। আল কুরআনে আল্লাহ প্রায় শতবার মুসা (আঃ) এর প্রসঙ্গে বলেছেন। মূসা (আঃ) বনী ঈসরাইলের নেতৃত্ব গ্রহণ

করেন তার নবুয়ত প্রাপ্তির পরপরই। তিনি ফিরআউন ও সভাসদদের সামনে সত্য কি তা তুলে ধরেন। আল্লাহ বলেন, “Pharaoh said,‘ Who then is the Lord of you two, O Moses? He said, ‘Our Lord is He Who gave unto everything the proper form and then guided it to its proper function." (Quran 20: 49-50).

এই আয়াত ব্যাপক অর্থবোধক। কেবল মানুষ নয়, জগতে যত সৃষ্টি রয়েছে (সৃষ্টি দিয়ে বুঝানো হচ্ছে প্রতিটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বস্তু ও প্রাণী) সবার ব্যাপারে আল্লাহ মূসা(আঃ) এর জবানে অব্যর্থ বাণী প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে সত্য, সুনির্দিষ্ট আকার আকৃতি ও স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন প্রত্যেকটিকে দিশা বা পথ চেনার যোগ্যতা। সামগ্রিকভাবে সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত।

এখন দেখুন- জগতে যে বিজ্ঞান দেখা যাচ্ছে- তাকে ভাগ করা যায়। জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান। আবার এখানে একটি ক্রম রয়েছে। জীববিজ্ঞানের মূল রসায়নে, আর রসায়নের মূলে রয়েছে পদার্থবিজ্ঞান। এখন যে পবিত্রতা অবলম্বন করে যুক্তি বুদ্ধি খাটায় সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে- এই যদি হয় জগতের শাসনকারী বিজ্ঞানের নমুনা- যথা একটির গভীরে আরেকটি এবং সবশেষে মোটে এক ধরণের শাস্ত্র- তবে জগতের স্রষ্টা এক ও একক একজন হতে বাধ্য।

ফিরআউন ও তাঁর সভাসদেরা-জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্তি বুদ্ধির অধিকারী ছিলনা বিধায় তারা মূসা (আঃ) এর জবান নিঃসৃত অমোঘ সত্যের কথাটি শোনেও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনে নি।

ফল হয়েছে কি?। ফিরআউনকে আল্লাহ তার বাহিনীসহ নীলনদে ডুবিয়ে মেরেছেন। তারা কি তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি? এরূপে যুগে যুগে আল্লাহ

অবিশ্বাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এজন্যেই আল্লাহ যুগের শপথ করে বলেন- মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। কেবল ফিরআউনের জাতি নয় বরং নবী করীম (সাঃ) পর্যন্ত অসংখ্য জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন তাদের পাপের কারণে। এসব জাতির মধ্যে প্রধান প্রধান কটি হলো নূহ (আঃ) এর জাতি, আদ জাতি, সামুদ জাতি, লুত (আঃ) এর জাতি। মানবেতিহাসের প্রারম্ভ থেকেই পূণ্য অসংখ্য জাতির কল্যাণ বয়ে এনেছে আর পাপ ডেকে এনেছে ধ্বংস। সুতরাং মানুষ কোনকালেই সম্পূর্ণরূপে লাভের মধ্যে ছিলনা। বরং অধিকাংশ মানুষই ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

২

মুমিন ব্যক্তির অবস্থা

সূরা আসরের তৃতীয় আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের সর্ম্পকে বলেন, "(ঐ লোকজন ছাড়া) যারা ঈমান এনেছে (তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়)।"

আল্লাহর ফয়সালা মুমিনদের পক্ষে আছে এবং আল্লাহ মুমিনদেরে ক্ষতিগ্রস্ত করেন না, না দুনিয়ায়, না আখেরাতে। সহীহ হাদীসে রাসূল (সাঃ) মুমিনদের সর্ম্পকে বলেন যে, এদের অবস্থা আশ্চর্য্যজনক। যখন এরা কষ্টে থাকে তখন সবর করে। সবর একটি অতি উচ্চ মাকাম। আল্লাহর ঘোষণা আছে, তিনি সবরকারীদের বেহিসাব পুরষ্কার দেবেন এ জগতেও, পরজগতেও। তো কষ্টক্লেশ, দুঃখ-যাতনা মুমিনদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে না। বরং এমন অবস্থা মুমিনদের জন্য পুরষ্কারের পূর্বাভাস।

রাসূল (সাঃ) আরো বলেন, "আর যদি এরা সুখে থাকে তখন আল্লাহর শোকর আদায় করে।" শোকর এক অতি উচ্চ মাকাম। সুতরাং মুমিনদের পুরো জীবনে লাভই লাভ। দুঃখেও লাভ, সুখেও লাভ। এর একটি চমৎকার উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তিটি যার কথা আল্লাহ সূরা ইয়াসীনে বলেছেন।

ঘটনা এরকমঃ কোন এক জনপদে লোকদেরে ঈমানের পথে আনার জন্য আল্লাহ প্রথমে দু'জন নবী প্রেরণ করেন। শহরবাসী তাদেরকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে ঈমানের পথে আসেনি। আল্লাহ অতঃপর তৃতীয় আরেক নবী প্রেরণ করেন পূর্বের দু' নবীকে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু পজেটিভ ফল লাভ হয়নি। বরং শহরবাসীকে সতর্ক করার জন্য শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক মুমিন ব্যক্তি দৌড়ে এসে নবীদের কথা শোনার জন্য শহরবাসীদের বললো। শহরবাসী রেগে গিয়ে ঐ মুমিনকে মেরে ফেললো। মৃত্যুর পরপরই মুমিন ব্যক্তিটির কাছে জান্নাত লাভের সুসংবাদ এসে গেলো এবং ব্যক্তিটি মহা আনন্দে দুনিয়ার কষ্ট

ক্লেশের কথা ও শহীদি মৃত্যুর কথা ভুলে গেলো। সে পরম শান্তির দেখা পেলো। তাই বলছি- মুমিন সর্বাবস্থায় লাভের দেখা পায়-সুখেও দুঃখেও।তবে একটি কথা রয়ে যায়-শুধু কি মুমিন হলেই লাভবান হয় কেউ, নাকি আরো কিছু করা লাগে? আল্লাহ ঐ আয়াতের দ্বিতীয়াংশে বলেন- "যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে (তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়)।" অর্থাৎ ঈমান আনা সেসঙ্গে সৎকর্ম করা হলো-ক্ষতি থেকে বাঁচার শর্ত। সৎকর্মের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত ইবাদাতগুলো যথাযথভাবে আদায় ও সেসঙ্গে সামাজিক ও পারিবারিক দায় মেটানো।

বিষয়সমূহ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের(সাঃ) নির্দেশিত পন্থায় করা। এজন্যেই আমরা বলি যে- জীবন গঠন করতে হবে- কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী, জীবন হবে ইসলামী আইন, কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা ও পালনের মাধ্যম।

৩

মানুষের দ্বিবিধ আচরণ

সূরা আল আসরের শেষাংশে আল্লাহ সৎকর্মশীল বান্দার আরো দুটো গুণ উল্লেখ করেন। যাদের এ দু'টি গুণ নেই তারা পথহারা (বিভ্রান্ত)। যাহোক, এই দুটি গুণ হলো ক্ষতিগ্রস্ত নয় এমন বান্দারা পরস্পরকে সত্যের দিকে ডাক দেয় এবং কষ্টক্লেশ আসলে সবরের পরামর্শ দেয়।

মানুষের মধ্যে অনেকেই আছে যারা আকীদাগত বিভ্রান্তিতে ভোগে। তারা আল্লাহর পরিবর্তে দেবদেবীর উপসনা করে এবং নিজের প্রয়োজনকে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করে নিয়ে নফসের ক্ষতি করে। স্মর্তব্য যে, মানুষের প্রয়োজন হলো যা নইলে নয় এবং যা শরিয়তসম্মত তা গ্রহণ করে বাকী সব প্রয়োজনকে পাশ কাটিয়ে জীবন যাপন করা। এই দুটি পথকে যথাক্রমে হুযুযে নফস ও হুকুকে নফস নামে অভিহিত করা হয়। হুযুযে নফস হলো বেঁচে

থাকার জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী গ্রহণ করা এবং তাতে লিপ্ত থাকা। যেমন একটি পরিবারের জন্য একটি বাসা বাড়ীই যথেষ্ট। এখন যদি পরিবারের কর্তা একাধিক বাড়ী বানায় বা ক্রয় করে, তবে সেটি হুযুযে নফস এর মধ্যে পড়ে। অন্যথায়, একটি বাড়ীর মালিক হুকুকে নফসের অধিকারী। হুকুকে নফস হলো যা নইলে নয় তার জন্য চেষ্টা সাধনা করা।

যেমন- বিয়েশাদী। একজনের জন্য (পুরুষ) একজন স্ত্রীই যথেষ্ট। যদি একজনের কোন সমস্যা থাকে তবে সর্বোচ্চ চার জন স্ত্রী গ্রহণ করা যেতে পারে। স্মর্তব্য, রাসূল (সাঃ) এর নয়জন, মতান্তরে এগারোজন স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু এটা ছিল আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যেই।

কিন্তু উম্মতের জন্য চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ। তেমনিভাবে- খানাপিনায় অতিরিক্ত ব্যয় ও বিলাসিতা পরিত্যাজ্য । এটি করতে পারলে অর্থাৎ পরিমিত খাবার গ্রহণ করতে পারলে হুকুকে নফস লংঘিত হয়

না। তেমনি-জীবনযাপনের সকল ক্ষেত্রে পরিমিত প্রয়োজনের অনুপাতে অন্ন–বস্ত্র-চিকিৎসা গ্রহণ করা হুকুকে নফসের অন্তর্ভূক্ত। যারা হুযুযে নফসে অভ্যস্ত তাদের বিপদ হলো- তার সত্যকে চিনতে ভুল করে। এটি দু'ভাবে হয়। অর্থাৎ- আকীদায় গলদ ও কর্মে নিফাক ও কুফরের মধ্যে পড়ে যাওয়া।

সুতরাং মুমিন সর্বদা নিজেই আকীদায় সত্যকে ধারণ করে ও প্রচার করে। আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশিত কর্মগুলো করে ও অন্যসব কর্ম পরিত্যাগ করে।

এই দুটি আকীদা ও কর্ম সঠিক স্থানে স্থাপনের জন্য মুমিনেরা পরকে সত্যের পথে ডাকে। আর কষ্ট ক্লেশ যা আসে সঠিক আকীদা ধারণের পরেও- তা নির্দ্বিধায় আল্লাহ নির্ধারিত বলে বিশ্বাস স্থাপন করে । নিজেরাও সবর করে ও অন্যকেও সবরের দাওয়াত দেয়। মাওলানা রুমীর একটি বয়েত আছে যা তিনি ফারসিতে লিখেছেন। বাংলা ও ফারসি উভয়টিই উদ্ধৃত করছি।

“সবর আরাদ আরযোরা নায় শেতাব, সবর কুন, ওয়াল্লাহু আ’লাম বিস সওয়াব।”
অর্থাৎ “সবর কাঙ্খিত ফল দেয়; তাড়াহুড়া নয়, সবর এখতিয়ার করো, আল্লাহ সবকিছু ভালোজানেন।”
এমনিভাবে- সকল তরীকতের মাশায়েখ তাদের অনুসারীদের সবরের উপদেশ দিয়েছেন ও বর্তমানের শায়খে কামেলরাও দিয়ে থাকেন।

পরিশেষে বলছি অত্যধিক নফসানী খাহেশাতের তাবেদারী হুযুযে নফসে নিয়ে যায়। আর পরিমিত খাহেশাত যা ফরজ পালনের জন্য দরকার তা এখতিয়ার করা হুকুকে নফসের দাবী মেটায়। আর যারা হুকুকে নফসের বাইরে না যাবেন তারা সফলকাম। ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন|

৪

ফ্রম সূরা ইনশিরাহ

এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দা ও নবীকে কী দিয়েছেন আর নবীর জন্য এখন কী করা উচিত- তার সংক্ষিপ্ত কিছু সারগর্ভ আলোচনা করেছন।

আমার উদ্দেশ্য এখানে পুরো সূরা নয় বরং ৫-৮নং আয়াত আমার আলোচনায় থাকবে। ৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি। নিশ্চয়ই কষ্টের পরই রয়েছে স্বস্তি।"

দুনিয়ায় মানুষের গোড়াপত্তন ও জাতি ভিত্তিক বিভক্তি করেছেন আল্লাহ একটি কারণে। আল্লাহ তায়ালা সূরা মূলকে বলেন, "পুণ্যময় তিনি, যার হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী; ক্ষমাময়।"

আল্লাহর উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্বচ্ছ। তিনি দেখতে চান কর্মে কোন মানুষটি শ্রেষ্ঠ। আর এটা তো সবাই জানে যে-কোন কিছু করতে গেলে- সাফল্য বা ব্যর্থতা আসতেই পারে। সাফল্যের সাথে যদি পবিত্রতা ও ইখলাস থাকে তবে সে কর্মীজন আল্লাহ দৃষ্টিতে সফল। অন্যথায় নয়। এখানে জীবন-মৃত্যু মুখ্য নয়। মুখ্য হলো কর্ম। কর্মের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে আল্লাহর ক্ষমায় অন্তর্ভূক্ত করতে পারে।
আল কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,"সকল প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ নেবে। আর আল্লাহ মানুষকে মন্দ দিয়ে ও ভালো দিয়ে পরীক্ষা করেন।"

সুতরাং যখন ভলো অবস্থা আসে তখনও উল্লসিত হবার সুযোগ নেই আর যখন মন্দ আসে তখন বিমর্ষ হবার সুযোগ নেই। কারণ এ দুটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূরণ হয়।
এজন্যেই আল্লাহ মুমিনদের এই দুটি নফস উল্লেখ করেছেন। মুমিনেরা পরস্পরকে হক্ব পথের সন্ধান

দেবে এবং পরস্পরকে দুনিয়ার কষ্ট ক্লেশের মধ্যে সবর করার উপদেশ দেবে।

যারা আল্লাহকে রব হিসেবে মানে না- তাদের বিপরীত অবস্থা। তারা হক্ব পথ সম্পর্কে জেনেও তা গ্রহণ করে না। তাদের এজন্যে দুটি গুনাহ। এক সঠিক আকীদার কথা জেনেও তা গ্রহণ না করা। অতঃপর নফসের খাহেশাত পূরণে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া।

আর যদি হক গ্রহণ করে তবে ইবাদত বন্দেগী, জীবনযাপনে অনেক বিপদাপদ দেখা দেয়। এমন বিপদের সময় আল্লাহর না-শোকরী না করে করা উচিত সবর। সকল হক্বপন্থী এমন কথায় আস্থা রাখেন। সূরা ইনশিরাহে ৫ম থেকে ৮ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন। এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।"

এখানে দুবার কষ্টের কথা ও দুবার স্বস্তির কথা রয়েছে। এভাবে দুবার কষ্টের পর স্বস্তির উল্লেখ করে আল্লাহ বলতে চান একটি কঠিনের পর দু'টি স্বস্তি রয়েছে।

অতএব, কষ্ট স্বস্তির অর্ধেক। মানুষকে আল্লাহ পরিশ্রম নির্ভর রূপে সৃষ্টি করেছন। দেখুন সূরা বালাদ। আর এই পরিশ্রম যদি একবার করা হয় তাহলে দু'বার স্বস্তি মিলবে। মানুষকে আল্লাহ বেশী পরিশ্রম করতে দেন না। যেমনটি- সূরা ইনশিরাহ থেকে জানা যায়। কারণ আল্লাহ রাসূল (সাঃ)-কে অবসর পেলে পরিশ্রম করার নির্দেশ দিয়েছেন। বুঝা গেল আল্লাহ মানুষকে কেবলই পরিশ্রম করান না- মানুষকে তিনি অবসরও দেন। যেন মানুষ আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে।

তাই এই সূরা থেকে জানা গেল আল্লাহ তায়ালা- দুনিয়ার জীবনকে এতো ফালতু কিছু বলেননি। তিনি জানেন, মানুষের পার্থিব ব্যস্ততা থাকবে। তবে আল্লাহর অভিপ্রায় হলো- যখন মানুষ পার্থিব ব্যস্ততা থেকে অবসর পাবে-তখন ইবাদাত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করবে। আর সর্বদাই মনকে আল্লাহ অভিমুখী রাখবে। আরও জানা গেল যে কঠিন ও সহজ অবস্থা একের পর এক আসতে থাকবে। একটি কঠিন অবস্থার পর-আল্লাহ দু'টি স্বস্তির সময় ও জীবন দেবেন।

৫

ফ্রম সূরা আত-তালাক্ব

জীবিকার জন্য মানুষের হা-হুতাশ করার কিছু নেই। জীবিকার জিম্মাদারী আল্লাহ তায়ালা নিজের কাছে রেখেছেন। যখন মানুষ খুব কষ্টে পড়বে তখন তার উচিত হবে সূরা আত্ব-তালাকের প্রতি মনোনিবেশ করা। এই সূরায় আল্লাহ বলেছেন, "যে আমাকে ভয় করে, তার জন্য মুক্তির পথ আমি করে দেবো। তাকে এমন স্থান থেকে জীবিকা দেব যা সে কখনো ধারণাই করেনি। আর যে আল্লাহর নিকট ভরসা স্থাপন করে, তার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। আর (আল্লাহ) তিনি তাঁর কাজ করেই ছাড়বেন। আর প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আল্লাহ লিখে রেখেছেন।"

তো কি বুঝা গেল। এক নম্বরে সে যে- আল্লাহকে প্রকাশ্যে-গোপনে ভয় করে। যখন এই ভয় জাগারুক

থাকবে তখন কঠিন অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ আল্লাহ করে দেবেন। দ্বিতীয় হলো- তিনি ধারণাতীত স্থান থেকে জীবিকার যোগান দেবেন ঐ আল্লাহ মনস্ক ব্যক্তিকে, পুরুষ বা নারী। তৃতীয়ত মানুষকে আল্লাহর নিকটই ভরসার খুঁটি গাড়তে হবে। আর যখন এটা করা হবে আল্লাহ ঐ যে বলেছেন জীবিকা দেবেন- সেই কাজ তিনি করেই দেবেন। চতুর্থতঃ- বেশী বা কম জীবিকা নিয়ে অভিযোগ করা চলবে না। কারণ- আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তুর একটি পরিমাণ তার কুদরতের খাতায় লিখে রেখেছেন। সুতরাং- বলুন, “লা তাহযান, ইন্নাল্লাহা মা’ আনা।”

৬

ফ্রম অল অব কুরআন

(ক) আলাহ বলেন- "প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। আর আমি (মানুষকে) মন্দ ও ভালো- উভয় অবস্থা দিয়ে পরীক্ষা করি।"

জীবনটা পরীক্ষার স্থান। যারা ঈমানের খাতায় রেজিষ্ট্রি করবে- তারা সকলেই পরীক্ষা দিয়ে পাশ-ফেলের অপেক্ষা করবে। আল্লাহ এই আয়াতে প্রথম পরীক্ষার আসবাব হিসেবে মন্দ বা ক্ষতিকে সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর বলেছেন- ভালো অবস্থার কথা। তবে মুমিনের জীবনে কষ্টই হয় বেশী। লাভ হয় সামান্যই। এই বিষয়টি মুকাদ্দারের ফয়সালা। এ নিয়ে কোন অভিযোগ চলবে না। ক্ষতি বা মন্দে পড়লে সবর করতে হবে। এই সবর করাটা একটা লাভ। আর যদি সুখ শান্তি আসে তবে শোকর আদায় করতে হবে। এই শোকরও লাভ। সুতরাং রাসূলুল্লাহ

(সাঃ) বলেছেন-মুমিনের অবস্থা আশ্চর্যজনক। লাভ-ক্ষতি উভয় অবস্থায় মুমিনেরা শান্ত-প্রফুল্ল থাকে। সে জানে যে- এগুলো আল্লাহর পরীক্ষা। আর পরীক্ষা কখনো দীর্ঘ হয় না। পরীক্ষার সময় স্বল্প।

অতঃপর যে সুখ শান্তি আসে তা অনেক দীর্ঘ কালের জন্য আসে। সুতরাং বলুন, "লা তাহযান।"

(খ) সূরা তোয়াহা'র একটি আয়াত হলো এমন, "মূসা (আঃ) বললেন, আমার রব যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার প্রত্যেকটিকে আকার-আকৃতি, অঙ্গ-সৌষ্ঠব দিয়েছেন এবং আরও দিয়েছেন প্রত্যেকের জন্য পথের দিশা।" এই আয়াত হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে কেউ আর মহাবিশ্বকে বিজ্ঞানের সৃষ্টি বলতে পারবে না। কারণ এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন-প্রত্যেক বস্তুর জীবন যাপনের বা আয়ুষ্কালের জন্য তিনিই পথ দেখিয়েছেন। অন্য কথায়- যেহেতু বস্তুবিশ্ব বিজ্ঞানের মাধ্যমে চলে তাই বিজ্ঞানের স্রষ্টা আল্লাহ। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনের জন্য পালনীয় কর্তব্য কী কী

হবে তা-ও আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন প্রত্যেককে। এখানে একটি বিষয় সুপ্ত আছে। সেটি হলো-যেহেতু মহাবিশ্ব শাসন করেন আল্লাহ বিজ্ঞানের মাধ্যমে-তাই বিজ্ঞানের রূপ হতে হবে মোটে একটি। বিজ্ঞানীরা বহু বছর পরিশ্রম করে প্রকৃতিতে প্রথমে চারটি শক্তি পরে আরো এগিয়ে তিনটি শক্তি, অতঃপর এখন তাদের আছে মোটে দুটি শক্তি। অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে প্রকৃতিতে মোটে একটি শক্তি। সেই শক্তির ধারক কে? জবাব আল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহই বিজ্ঞানকে এককত্ব দিয়েছেন-কেননা তিনি নিজেও একাকী। তিনি একাকী সমগ্র মহাজগতে যতকিছু আছে সবকিছুর স্রষ্টা। কেবল স্রষ্টা নন বরং শাসকও বটে।। এই শাসনের জন্য তিনি মোটে একটি শক্তি ব্যবহার করেন। এভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়-আল্লাহ অস্তিত্বে আছেন এবং প্রতিটি মূহুর্তে কাজ করে চলেছেন। এতে তার কোন ক্লান্তি আসে না। মানবীয় সকল ক্রটি থেকে তিনি পবিত্র। তিনি মহাজগতের একমাত্র সত্তা যিনি ক্রটিমুক্ত। না তন্দ্রা,না ঘুম, না ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে।

সুতরাং এই আল্লাহর উপাসনা করা কি কর্তব্য নয়? হ্যাঁ- এটাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য। অন্যসব কর্ম মানুষের প্রাত্যহিক জীবিকা অর্জনের সহায়ক। কিন্তু জীবিকার পেছনে পড়ে থাকলে চলবে না। আল্লাহর বন্দেগীও করতে হবে। তাই ঈমানের বাক্য মনে প্রাণে উচ্চারণ করতে হবে। সেটি কি? “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।”

সুতরাং বলুন, “লা তাহযান- ইন্নাল্লাহা মা আনা।”

৭

উপকারীর টিকে থাকা

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপি নাস্তিকতা ও বিবর্তনবাদ মানুষের বিবেককে ক্রয় করে ফেলেছে। নাস্তিকতা তো কোন কালেই যুক্তির নিরিখে গ্রহণীয় হয়নি। হয়েছে আবেগ ও খোঁড়া বিজ্ঞানের উপর ভর করে। পক্ষান্তরে, আল্লাহর বিশ্বাস যেমন আবেগি, তেমনি যুক্তিযুক্ত একটি বিষয়। সুতরাং এ নিয়ে আমাদের বলার চেয়ে আল্লাহর কথাই শুনি না কেন? আল-কুরআনে যত আয়াত আছে- তার মধ্যে ঈমানই বেশির ভাগ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবন দিয়ে আল্লাহর উপর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এ দুটি প্রমাণ বিদ্যমান থাকতে আমরা আর কোন প্রমাণ চাই।

তবে, নাস্তিকতার চেয়ে বিবর্তনবাদ বেশী বিজ্ঞান নির্ভর মিথ্যাবাদীতা। বিবর্তনবাদ প্রথমতঃ বির্বতন তথা mutation এবং তারপর নিম্নযোগ্যতা থেকে

উচ্চতর যোগ্যতার প্রাণীর আবির্ভাব ও টিকে থাকা। এটিই বির্বতনবাদের মূলকথাঃ Survival of the fittest তথা যোগ্যতমের টিকে থাকা। কিন্তু এটি একটি ভ্রান্ত মতবাদ। পৃথিবীতে যারা শক্তিসামর্থ্য নিয়ে টিকে আছে- তারা সকলেই যোগ্যতম নন। বরং অনেক অসাধু ব্যবসায়ী, জুয়াড়ী, খুনী, ধর্ষণকারী বহাল তবিয়তে শক্তিসামর্থ্য নিয়ে পৃথিবীতে টিকে আছে।

এর বিপরীতে আল্লাহ তায়ালা সঠিক তত্ত্বটি তুলে ধরেছেন আল কুরআনে। আল-কুরআনের সূরা রাদ এর ১৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "Now, as to the foam, it goes away as rubbish, but as to that which benefits men, it stays on the earth." (Quran 13:17).

এখানে আল্লাহ যে তত্ত্বটি বিবৃত করেছেন-তা হলো "Survival of the benefactor."

অর্থাৎ যারা উপকারী, নিজের জন্য ও অপর মানুষের জন্য, কেবল তারাই পৃথিবীতে থেকে যায়। আর

যারা শক্তি সামর্থহীন তারা না নিজের, না অপরের কোন উপকার করতে পারে। তারা রাবিশের মত। এদেরকে আল্লাহ উপমা দিয়েছেন foam বা ফেনা বলে। দেখুন, ফেনার উপাদান সংখ্যায় অসংখ্য কিন্তু কোন উপাদানই কারো কাজে লাগে না। এরা অনুপকারী রাবিশ। এদেরকে তাই আল্লাহ পৃথিবীতে টিকে থাকতে দেন না। অপরদিকে যারা নিজের উপকার করে- তারা তো নিজের টিকে থাকার পথে এক কদম এগিয়ে গেল। আর তারা যখন অন্যেরও উপকারে লাগে তখন অন্যেরা তাঁকে ভালোবাসে ও তাঁর কল্যাণে জান প্রাণ দিয়ে কাজ করে। এটাই হলো উপকারী বা benefactor এর টিকে থাকার রহস্য।

এই তত্ত্বটি আল-কুরআনে ছিল ১৪০০ বছরেরও পূর্ব থেকে যখন বিবর্তনবাদের নামগন্ধ ছিল না। আধুনিক কালে এসে যখন বিবর্তনবাদ প্রকাশিত হলো-তখন আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় মানুষদের দিয়ে কুরআনিক তত্ত্বটি যা বিবর্তবাদের বিপরীতে পৃথিবীতে মহাকাল ধরে টিকে আছে, সেই তত্ত্বটি প্রকাশ করে দিলেন।

এখন কেউ কি আছে যে, কুরআনের মোকাবেলায় আরো উন্নত ও যুক্তিসমৃদ্ধ তত্ত্ব দিতে পারে? নেই।

আল-কুরআনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে যুদ্ধ করে কোন দিন কেউ সুবিধা করতে পারেনি। আজও পারবে না।

সুতরাং- এক কথায় এ অধ্যায় শেষ করা যায়।

"Survival of the fittest" নয়, বরং "Survival of the benefactor." এটাই আল্লাহর সৃষ্টি জগতে চলমান মহাশক্তি। আল্লাহর শক্তি বিজ্ঞান নয় কেবল বরং অনেক উচ্চতর প্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহ। আল্লাহর সৃষ্টি টিকে আছে একারণেই।

৮

আল্লাহর হাত

আল- কুরআনের সূরা যারিয়াতের ৪৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast extent (thereof)” (Quran 51:47).

এই আয়াতে দুটি অংশ। প্রথমে রয়েছে এই যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে মহাশক্তির প্রয়োজন ছিল এবং সেই শক্তির আধার আল্লাহ।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তাঁর শক্তিবলে এই মহাবিশ্বকে বিশালাকৃতি দান করেছেন। এখানে বুঝতে হবে যে মহাবিশ্ব স্থির নয় বরং প্রতিনিয়ত এর আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে।

এই সম্প্রসারণ আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টি দুটি শক্তি বলে করে চলেছেন। একটি হলো ডার্ক এনার্জি। এটি অনেকটা বেলুনে বায়ু ঢোকানোর মত। যখন বায়ু

বেলুনে ঢুকে, তখন বেলুনের সারফেস বেড়ে যায়। ফলে বেলুনের আকৃতি বড় থেকে বড় হতে থাকে।

অন্য আরেকটি শক্তি হলো-মহাকর্ষ। যখন বস্তুসমূহ নিকটে থাকে তখন মহাকর্ষ বল তার শক্তিবলে বস্তুসমূহকে দূরে যেতে দেয় না। অর্থাৎ মহাকর্ষ মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের বিপক্ষে যায়। এখন আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে পেয়েছেন যে, অতীতে একটা বড় মহাকাল ছিল যখন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ধীর ছিল। এখন ডার্ক এনার্জি যখন হাল পেল- মহাবিশ্ব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। সুতরাং বলা যায়- আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতিতে এমন শক্তিও রেখেছেন যার ফলশ্রুতিতে বিশাল মহাবিশ্ব বিশালতর হচ্ছে- অতীতে যে সম্প্রসারণ ধীর ছিল এখন তা ত্বরিত গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আচ্ছা বলুন দেখি- আল কুরআন নাযিলের সময় এসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কে জানতো? কেউই না। আল্লাহ জানতেন, বলেও দিয়েছেন। আর সাড়ে চৌদ্দশত বছর পর বিজ্ঞানীরা আল কুরআনের মধ্যে

তাদের গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ দেখছেন। সুতরাং কুরআন সত্য।

আল-কুরআন এক চিরকালীন সত্যবাহী কিতাব। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্নভাবে এটি প্রমাণ করেছেন এবং বলেছেন যে- মানুষও কুরআনের সত্যতা বুঝতে পারবে। সূরা হা-মীম আস সাজদাহ এর ৫৩নং আয়াতে বলেন আল্লাহ, "Soon we will show them our signs on the horizons and within themselves until it will be manifest unto them that it is (the Quran) the Truth." (Quran 41:53).

কী আশ্চর্যজনক কথা! মানুষ নবীজীর (সাঃ) জীবনকালে কুরআনকে অবজ্ঞা করতো অনেকে। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন- "সত্ত্বরই সময় আসবে- যখন দিগ দিগন্তে বিজ্ঞানের আবিষ্কার কুরআনের প্রফেসির সাথে মিলে যাবে এবং মানুষ কুরআনকে সত্য হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হবে। তেমনিভাবে- চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের নিজেদের দেহে

এমনসব কৌশল দেখা দেবে- যা কুরআনের সত্যতা তুলে ধরবে।
আল্লাহ তায়ালা বহুবার বহুভাবে আল-কুরআনে মানুষের মধ্যে অবস্থিত নেয়ামতের কথা বলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ সূরা বালাদে রয়েছে, “Have We not given him two eyes, And a tongue and two lips.” (Quran 90:89).

এখন কেবল চক্ষু নিয়ে গবেষণা করে অত্যাশ্চর্য সব বিজ্ঞানের দেখা মিলেছে। অনুরূপভাবে জিহবা ও ঠোট নিয়েও মানুষের বিস্ময় ফুরায় না। তাই আল্লাহ বলছেন- বিজ্ঞান একদিন কুরআনের সত্যতা তুলে ধরবে। তখন- আর কারো ঈমানহীন থাকা যুক্তিযুক্ত হবে না। সুতরাং আসুন- কুরআন ও বিজ্ঞান গবেষণা করি ও সমৃদ্ধ হই জ্ঞান-প্রজ্ঞায় ও আল্লাহর বিশ্বাসে ও নির্ভরতায়।

৯

আগে কঠিন, পরে স্বস্তি

আল-কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ৩৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “Every soul must taste of death and We try you with evil and with good, for ordeal.” (Quran 21:35).

এই আয়াতে কারীমার দুটি অংশ। প্রথমেই রয়েছে মৃত্যুর সংবাদ যা খুবই কঠিন। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে আগে কঠিন, পরে স্বস্তি। সূরা মুলকে রয়েছে, “ He Who hath created death and life that He may try you, which of you is best in conduct.” (Quran 67:2).
এই আয়াতেও প্রথমে রয়েছে কঠিন অর্থাৎ মৃত্যু, পরে স্বস্তির কথা অর্থাৎ জীবন। পরে আল্লাহ বলেছেন, এটা তিনিই এ কারণেই করেছেন যেন তিনি পরীক্ষা করতে পারেন কে কর্মে সর্বোত্তম।

এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। জীবন মৃত্যু মুখ্য নয়, মুখ্য হলো কর্ম। কর্মে যে সর্বোত্তম সে-ই সফল।

এজন্যেই ইসলামে লেনদেন, সামাজিকতা ও চরিত্র, এই তিনটি বিষয়ে ন্যায় ও সত্য সহকারে ডিল করার হুকুম এসেছে। কেবল ইবাদাত, বিশ্বাস ইসলাম নয়। ইসলামের পূর্ণ রূপ হলো- আকীদা বিশ্বাস, ইবাদাত যথাযথভাবে আদায় তো করতে হবেই- সেসাথে লেনদেন, সামাজিকতা ও চারিত্রিক পূণ্যময়তা এখতিয়ার করতে হবে। সূরা ইনশিরাহেও প্রথমে কঠিন ও পরে স্বস্তির কথা বলা হয়েছে ঐ সূরার ৫নং ও ৬নং আয়াতে। “But Lo! with hardship cometh ease, Lo! with hardship cometh ease.” (Quran 94 :5-6).

সুতরাং মানবজীবনে পরীক্ষার নিমিত্তে কঠিন ও সহজ দুটোই আসে। তবে এই পরীক্ষা সকল মানুষের জন্যে নয়। যারা ঈমান এনেছে- তারাই এই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। ঈমান নেই তো পরীক্ষাও নেই।

সুতরাং “লা তাহযান, ইন্নাল্লাহা মা’আনা।” “হতাশ হবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।” আল্লাহ যখন দেখেন- মুমিন মানুষটি ধৈর্য্যের সাথে কঠিন সময়েও আল্লাহর বন্দেগী করছে- তখন তার প্রতি তিনি সদয় হয়ে যান এবং কঠিন অবস্থা অপসারণ করে স্বস্তির জীবন দেন।

সুতরাং সুখে-দুখে বলতে হবে, “আলহামদুলিল্লাহি আ’লা কুল্লি হাল।” অর্থাৎ সকল হালতে আল্লাহর প্রশংসা।

১০

সৃষ্টির স্থায়িত্ব

আল-কুরআনের সূরা ফাতিরের ৪১নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “Surely, Allah hold the heaven and the earth lest they deviate. And if they did deviate, none can sustain them thereafter.”

বাংলায়, “বস্তুত: আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ধরে রেখেছেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায়, তবে তিনি ব্যতিত এমন কেউ নেই, যে এগুলো ধরে রাখতে পারে।” আরো মূলানোগ অনুবাদ হতে পারে তা যা আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী লিখেছেন,“It is Allah who sustains the heavens and the earth, lost they cease (to function) : And if they should fail, there is none-note one-can sustain them there after.” (Quran 35:41).

অর্থাৎ আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে অস্তিত্ববান রাখছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ এ কাজের সামান্যতমও আঞ্জাম দিতে অক্ষম। মহাবিশ্বের প্রতিটি ছোট থেকে ছোট, বড় থেকে বড়-বস্তু তাদের নির্ধারিত ফাংশন করে চলেছে কেবল আল্লাহর মদদে। আল্লাহ যদি প্রতিটি সৃষ্টি বা নোকতাকে প্রতি মুহূর্তে মনোযোগ না দেন, তবে সেগুলো তাদের নির্ধারিত কাজ করতে পারবে না, এমনকি অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ আরো বলছেন যে, যদি এগুলো তাদের ফাংশন আঞ্জাম দিতে ব্যর্থ হয়ে যায়, তবে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে এসবকে নিজ নির্ধারিত ফাংশন করতে দিতে পারে। তবে আল্লাহর কাজ আল্লাহ করবেনই। আল্লাহ তার কালামে এ বিষয়টি এইভাবে বলেছেন, "ইন্নাল্লাহা বালিগু আমরিহী।" অর্থাৎ আল্লাহ যে কাজ করবেন বলে বলেছেন, তা তিনি করে ছাড়বেনই। সুতরাং মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে টিকিয়ে রাখা আল্লাহর ইচ্ছা, তাই তিনি মহাবিশ্বকে টিকিয়ে রাখবেনই। সূরা মুলকে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "(জেনে রাখো)

(আল্লাহ) তিনি কি জানবেন না যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সদা সাবধান।”

এখানে দুটি সিফাত; তথা প্রতিটি খুটিনাটি বিষয়েও তিনি ওয়াকিবহাল আর এটি করেন তিনি, কারণ তিনি সদা সজাগ।

তাই বলছি-আল্লাহর দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। তিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয়েও নজর বুলান এবং প্রতি মুহূর্তে তিনি সৃষ্টির অস্তিত্ব দিয়ে চলেছেন।

তাই- ছোট থেকে ছোট গুণাহও যেন আমাদের থেকে সংঘটিত না হয়-সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। আল্লাহ তৌফিক দেনেওয়ালা।

১১

উপসংহৃতি

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় যা লেখা হলো -তা হয়তো সকলেই পূর্ব থেকে জানেন না। তাই লিখলাম কুরআন থেকে কয়েকটি সূরা ও কয়েকটি আয়াত থেকে যা বোধগম্য হয় তা। তো পাঠক, চিন্তা করুন এই বইয়ের লেখাগুলো নিয়ে। আপনিও হতে পারেন একজন প্রকৃত মুসলিম। প্রকৃত মুসলিমকে কেবল কিতাব তথা আল কুরআন ও আল হাদীস নিয়ে বসে থাকলে না। বরং কুরআন-হাদীসের বিষয়বস্তু নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমি আমার প্রথম জীবন কাটিয়েছি গাফেল থেকে। অত:পর আল্লাহ আমাকে পাঠে মনোনিবেশ করার সুযোগ দিয়েছেন ।

এতে করে আমার কত যে লাভ হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। আল-কুরআন কয়েকটি সমুদ্র ধারণ করে তার কলেবরে। এত জ্ঞান আর এত তথ্য ও তত্ত্ব রয়েছে আল কুরআনে যে, মানুষ দিশেহারা হয়ে যেতে পারে। এটাও একটা কারণ যে-কুরআন ২৩

বছরব্যাপি একটু একটু করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সীনায় প্রেরিত করে দেয়া হয়েছে। রাসূল (সাঃ) এর পর কুরআনের তাফসির তথা জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জিত হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর। তিনি মুফাসসিরদের আদি গুরু। বাংলা ভাষায় তাফসিরে ইবনে আব্বাস অনুদিত হয়েছে।

অতঃপর ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ তাফসির রচনা করেছেন হযরত আবদুল কাদির দেহলবি (রহঃ)। তার তাফসির বাংলায় অনুদিত হয়েছে। খুবই মূলানুগ এই তাফসির। প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলিমের উচিত শায়খ আবদুল কাদির দেহলবি (রহঃ) এর তাফসির সঙ্গে রাখা। অতঃপর রয়েছে-অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের তাফসির-তাফসিরে আশরাফি। হযরত আশরাফ আলী থানভি (রহঃ) এর রচয়িতা। অতপরঃ রয়েছে- মারেফুল কুরআন যার লেখক হযরত শফী (রহঃ)। বাংলায় সংক্ষিপ্ত আকারে এর অনুবাদ করেছেন মাওলানা মরহুম মুহীউদ্দিন খান সাহেব (রহঃ)।

এই গেল আপনার জন্য কতিপয় জ্ঞান ভান্ডারের ঠিকানা। আপনারা লেগে পড়ুন কুরআন অধ্যয়নে। দেখবেন, জীবনের দুঃখ-যাতনা আর আপনাকে বিষন্ন করতে পারবে না। তাই বলুন, "লা তাহযান, ইন্নাল্লাহা মা' আনা।"

১২

শেষ কথা

আমি দুর্বল, রুগ্ন ও অসহায়। তবু সর্বদাই কিছু লিখি। এভাবে প্রায় ২৫টি ছোট-বড় ইসলামী সাহিত্যের বই লিখেছি। পাঠকপ্রিয়তা কতটুকু লাভ হয়েছে জানি না। তবে আমি লিখি কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। আল্লাহ যদি সন্তুষ্ট থাকেন আমার উপর- তখন অন্য কিছুর আশা করাটা বোকামী। পাঠকের কাছে আমার আরজ, লেখকের জন্য দোয়া করবেন যেন, সুস্থ থেকে কিছু ভালো কাজ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে পারি এবং আল্লাহ আমার দিকে প্রফুল্ল চিত্তে দৃষ্টি দেন। তবেই আমি ধন্য। আল্লাহর ভালোবাসা অন্তরে আরো দৃঢ়তা পায়, হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রেমপ্রার্থী আমি, সেটাও যেন দৃঢ়তা পায়। আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (সাঃ) ছাড়া এ জীবনে আর কি আছে? জীবনটা আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের (সাঃ) প্রেমে ভরপুর থাকুক ।

অত:পর স্মর্তব্য, মানুষের হৃদয়ে ৪টি উৎস থেকে প্রেরণা আসে। কিন্তু সবগুলোর মূলে আল্লাহ।
তবে- আল্লাহ নিজেও প্রেরণা প্রেরণ করেন। এটিকে বলে, "খাওয়াতিরে রাহমানী।"

অতঃপর আছে "খাওয়াতিরে শাইতান।" শয়তান মানুষের হৃদয়ে এটি অর্থাৎ পাপের প্রেরণা দেয়। অতঃপর রয়েছে, "খাওয়াতিরে নাফস।" মানুষের নাফস ভালো-মন্দ উভয়টিই হৃদয়ের অলিন্দে ঢেলে দেয়। তবে শয়তানের প্রেরণা থেকে নাফসের প্রেরণা বেশী শক্তিশালী। ফেরেশতাদের দ্বারা আল্লাহ মানুষের হৃদয়ে পূণ্যময় প্রেরণা প্রেরণ করেন। এগুলোকে ইলহাম, কাশফ ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। মানুষকে হৃদয় নিয়েই যেহেতু সময় কাটাতে হয়- তাই মানুষের উচিত হৃদয়কে আয়নার মত স্বচ্ছ বানানো যেখানে রাহমানী প্রেরণা ছাড়া আর কিছু প্রক্ষিপ্ত হবে না।

এজন্যেই ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো- তাসাওউফ। একে তাযকিয়ায়ে নফসও বলা হয়।

অর্থাৎ হৃদয়কে উত্তরোত্তর আল্লাহর নিকটবর্তী করা ও সকল প্রকার পাপ ও পাপের চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার নাম "তাযকিয়ায়ে নাফস"। এজন্যে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তবে সবচেয়ে কার্যকরী আমল হলো ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত থেকে ফারেগ হয়ে "যিকিরে" লেগে যাওয়া। সবচেয়ে ভারী যিকির হলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-র যিকির।" দৈনিক কমপক্ষে ১০০ বার এই যিকির করা চাই। জীবনটা আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের (সাঃ) প্রেমে ভরপুর থাকুক এই আশা নিয়েই এই পুস্তিকার ইতি টানলাম।